মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ভূতের বাচ্চা সোলায়মান

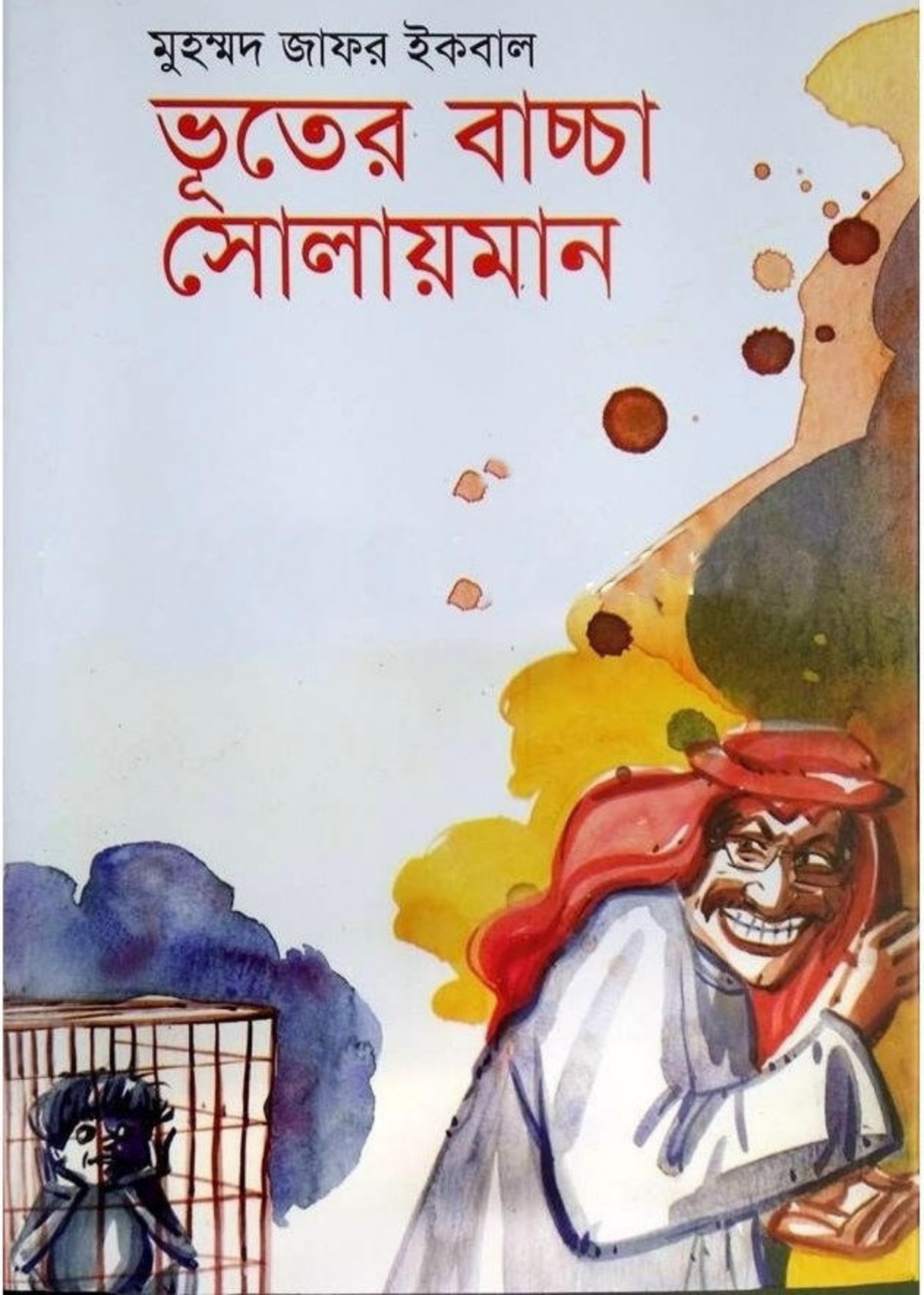

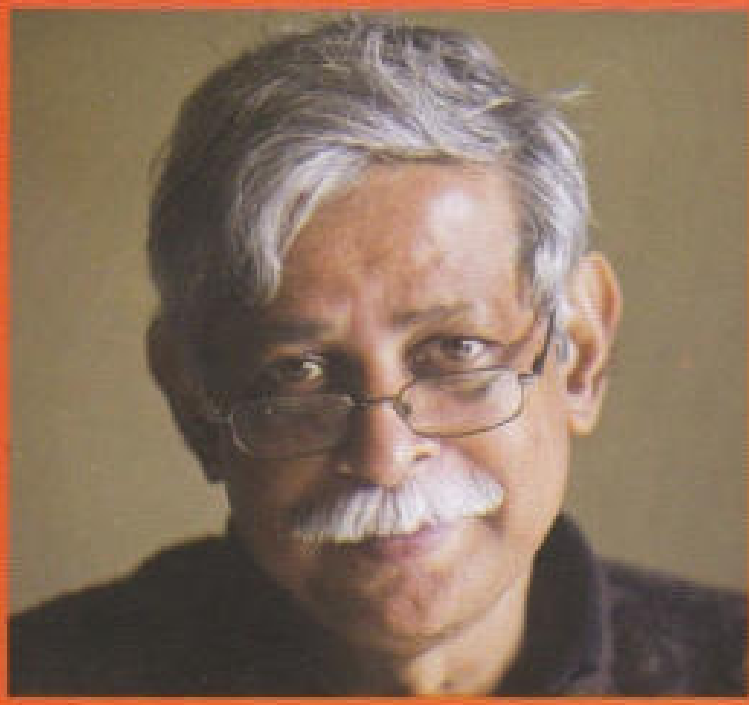

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

জন্ম : ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫২, সিলেট। বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ফয়জুর রহমান আহমেদ এবং মা আয়শা আখতার খাতুন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র, পিএইচডি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন থেকে। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি এবং বেল কমিউনিকেশান্স রিচার্সে বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করে সুদীর্ঘ আঠার বছর পর দেশে ফিরে এসে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

স্ত্রী প্রফেসর ইয়াসমীন হক, পুত্র নাবিল এবং কন্যা ইয়েশিম।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: বিপ্লব সরকার

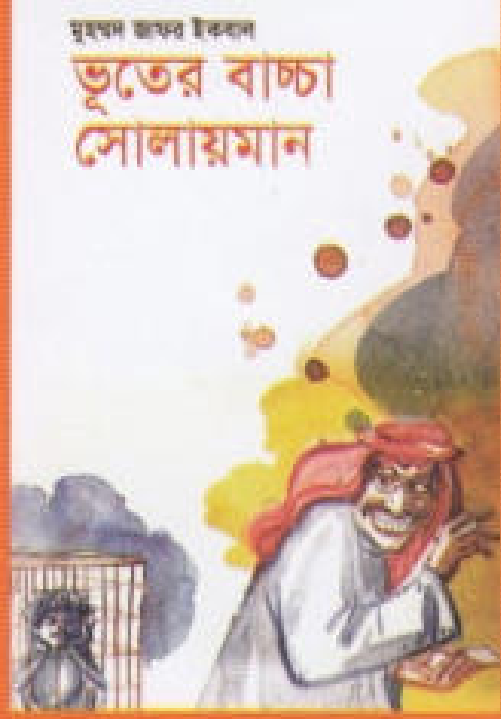

নীতু বিস্ফারিত চোখে বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা ডেকেছি বলে এসেছ? তার মানে তুমি ভূত? ভূতের বাচ্চা?'

বাচ্চাটা মাথা নেড়ে তার চোখ মুছল। নীতু কী বলবে বুঝতে পারল না, ঢোক গিলে কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, 'তুমি কাঁদছ কেন?'

বাচ্চাটা বলল, 'কাঁদব না তো কী করব? ডেকে ডেকে আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছ? এখন আমি আটকা পড়েছি, যেতে পারছি না। আমার আম্মুকেও দেখতে পাচ্ছি না।'

'আম্মুকে দেখতে পাচ্ছ না?'

'না।' বলে বাচ্চাটা আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল। নীতু গলার স্বর নরম করে বলল, 'শোনো, শোনো, তুমি কেঁদো না। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।'

'কচু ঠিক হবে। কী বিশ্রী জায়গা! গরম আর ধুলা। আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

ভূতের বাচ্চা সোলায়মান

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

জাগৃতি প্রকাশনী

ভূতের বাচ্চা সোলায়মান

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

প্রথম প্রকাশ	:	অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ	:	অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৭
প্রকাশক	:	রাজিয়া রহমান জাগৃতি প্রকাশনী ৩৩ আজিজ সুপার মার্কেট নিচতলা, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০ E-mail : jagritibook@gmail.com Facebook : Jagriti Prokashony
স্বত্ব	:	লেখক
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ	:	বিপ্লব সরকার
মুদ্রণ	:	প্রিয়মুখ প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ সলিউশন ৪২, আরামবাগ, ঢাকা
মূল্য	:	দুইশত পঞ্চাশ টাকা
Online distributor	:	www.rokomari.com/jagritiprokashony
Price	:	**Tk 250 / $11 only**
ISBN	:	978-984-92392-2-2

BDeBooks.Com

ভূমিকা

মাঝে মাঝেই আমি টেলিভিশন কিংবা মঞ্চের জন্যে নাটক লিখেছি! কিছু কিছু নাটকের গল্পটা আমার নিজের কাছেই ভালো লেগে যায়, তখন আমার সেটাকে একটা বই হিসেবে লেখার ইচ্ছে করে, ভূতের বাচ্চা সোলায়মান সে রকম একটা নাটক।

যাদের বসে বসে ইউটিউবে নাটক দেখার ধৈর্য নেই তাদের জন্যে এই বই।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
১৬.০১.২০১৭

১

শেষ পর্যন্ত ঢং ঢং করে ছুটির ঘণ্টা পড়ল। নীতুর মনে হচ্ছিল ক্লাসটা বুঝি আর শেষ হবে না কিন্তু শেষ পর্যন্ত শেষ হলো। ক্লাসটা পড়ান রাজ্জাক স্যার, রাজ্জাক স্যারের চেহারাটা এমন যে তাকে দেখলেই হাই উঠে যায়। আর স্যার যখন ঢুলু ঢুলু চোখে নাকে টেনে টেনে আস্তে আস্তে কথা বলেন তখন আর কোনোভাবে চোখ খুলে রাখা যায় না। অনেক কষ্ট করে নীতু তার চোখ খুলে রেখেছিল– একটু পরে পরে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখছিল ক্লাসটা শেষ হয় কীনা। শেষ পর্যন্ত ক্লাস শেষ হলো আর ঢং ঢং করে ছুটির ঘণ্টা বেজে উঠল তখন নীতুর মনে হলো তার কানে বুঝি কেউ মধু ঢেলে দিচ্ছে। সে বইগুলো বেগে ভরে তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

রাজ্জাক স্যারের মনে হয় কিছুক্ষণ সময় লাগল বুঝতে যে ছুটির ঘণ্টা পড়ে গেছে। যখন বুঝলেন তখন খুবই ধীরে ধীরে তার বই-খাতা, চক-ডাস্টার হাতে নিলেন, তারপর ছোট ছোট পা ফেলে শামুকের মতো আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে ক্লাসরুমের দরজার দিকে যেতে লাগলেন। ক্লাসের সব মেয়ের সঙ্গে নীতু ধৈর্য ধরে স্যারের ক্লাসরুম থেকে বের হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর সবাই মিলে একটা গগনবিদারী চিৎকার দিয়ে ক্লাস থেকে বের হওয়ার জন্যে ছুটতে শুরু করল। তাদের দেখলে মনে হবে কেউ বুঝি ক্লাসের ভেতর একটা বোমা ফেলে দিয়েছে, বোমাটা এক্ষুনি ফাটবে আর সেটা ফাটার আগে যেভাবে হোক ক্লাসরুম থেকে বের হয়ে

যেতে হবে।

নীতু ধাক্কাধাক্কি করে ক্লাসরুম থেকে বের হয়ে এলো এবং তখন একটু শান্ত হলো। বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তারা স্কুল গেটের দিকে এগোতে থাকে। তাদের স্কুলের দারোয়ান গেটটা খুলে ভ্রুকুঁচকে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে আছে, দারোয়ানদের মনে হয় সবার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাতে হয়, সবাইকে সন্দেহ করতে করতে তাদের ভ্রু মনে হয় পাকাপাকিভাবে কুঁচকে গেছে।

যাদের বাসা দূরে কিংবা যাদের বাসা খুব বেশি দূরে না কিন্তু হেঁটে অভ্যাস নেই তাদের গাড়ি এসে অপেক্ষা করছে। মেয়েরা তাদের গাড়িতে উঠছে, আর হুশ করে গাড়ি বের হয়ে যাচ্ছে। নীতু তাদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। তার বাসা স্কুল থেকে খুব বেশি দূরে না, অনেক মেয়েই এই দূরত্ব হেঁটে যেতে চায় না কিন্তু নীতু প্রতিদিন হেঁটে হেঁটে বাসায় যায়। চারপাশে দেখে হেঁটে যেতে তার খুব ভালো লাগে। খুব ছোট ছোট জিনিস যেটা কেউ লক্ষ্য করে না নীতু সেটাও খুব ভালো করে লক্ষ্য করে। যেমন মোড়ে একজন মুচি বসে জুতো সেলাই করে, তার সামনে দিয়ে কেউ হেঁটে গেলে সে চোখ তুলে তার জুতাটা দেখে কিন্তু কখনোই মুখ তুলে মানুষটার চেহারাটা দেকে না। কিংবা সখিনা রেস্টুরেন্টের বাইরে যে মানুষটা ডেকে ডেকে খদ্দেরদের ভেতরে নেয়ার চেষ্টা করে, সে সবাইকে ডাকাডাকি করে না, বেছে বেছে কিছু মানুষকে ডাকে, যাদের দেখে মনে হয় তারা সখিনা রেস্টুরেন্টে বসে মোগলাই পরোটা খাবে। নীতুর সবচেয়ে মজা লাগে ওভারব্রিজের ওপর বসে থাকা বুড়ো ভিখিরিটাকে দেখতে, আশেপাশে কেউ না থাকলে তাকে দেখে মনে হয় খুবই হাসিখুশি সুখী একজন মানুষ। কিন্তু কেউ কাছে এলেই সে মুহূর্তের মাঝে মুখটাকে দুঃখী করে ফেলে দেখে মনে হয় নিঃশ্বাস আটকে সে এক্ষুনি বুঝি মারা পড়বে!

নীতু ওভারব্রিজ পার হয়ে রাস্তার অন্য পাশে গিয়ে ফুটপাতে পুরনো বইয়ের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পেছনে অনেকগুলো

বই সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সামনে একটা নীল প্লাস্টিক বিছালো, তার ওপর অনেকগুলো বই এলোমেলো করে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। বাসায় যাওয়ার সময় নীতু প্রত্যেকদিন এখানে থেমে বইগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। মাঝে মাঝে সে মজার বই পেয়ে যায়। একবার শামসুর রাহমানের একটা কবিতার বই পেয়েছিল, যেখানে কবি শামসুর রাহমান নিজে অটোগ্রাফ দিয়ে বইটি একজনকে উপহার দিয়েছেন!

নীতু বইগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, তখন হঠাৎ করে একটা বই তার চোখে পড়ল। বইটির নাম "প্রেতসাধনা"। প্রেতকে নিয়ে কীভাবে সাধনা করা যায় দেখার জন্যে সে বইটি হাতে নেয়, অনেক পুরনো বই, পৃ"াগুলো হলুদ হয়ে গেছে। বইয়ের ভাঁজে ভাঁজে অনেক জায়গায় কোনো একজন মানুষের হাতে লেখা কথাবার্তা। এ রকম বই নীতুর খুব মজা লাগে, মনে হয় শুধু বইটি নয় বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝি একটা মানুষের কাহিনীও পড়ে ফেলছে। নীতু বইটা হাতে নিয়ে দোকানের মানুষটাকে জিজ্ঞেস করল, "মামা, এটা কত?"

নীতু মাঝে মাঝেই মানুষটার কাছ থেকে বই কেনে তাই মানুষটা তাকে চেনে, সে হাসি হাসি মুখ করে বলল, "বিশ টাকা।"

"এই বই বিশ টাকা? বইটার অবস্থা দেখেছেন?"

মানুষটা দাঁত বের করে হাসল, বলল, "বই যত পুরানা হয় তার দাম তত বেশি!"

নীতুও দাঁত বের করে হাসল, বলল, "বইটাও সে রকম একটা বই হতে হয়! এটা সে রকম বই না।"

মানুষটা জিজ্ঞেস করল, "কত দেবেন?"

"দশ টাকা।"

"পনেরো"

নীতু মাথা নাড়ল, বলল, "না। দশ টাকা।"

মানুষটা তখন হতাশার মতো ভঙ্গি করে বলল, "ঠিক আছে। দেও।"

নীতু তার ব্যাগ থেকে দশ টাকা বের করে মানুষটার হাতে দিয়ে বইটা দেখতে দেখতে বাসার দিকে এগোতে থাকে। দেখে মনে হতে পারে একটা বই দেখতে দেখতে ফুটপাথ ধরে মানুষের ভিড় ঠেলে হেঁটে যাওয়া বুঝি খুব কঠিন। আসলে এটা মোটেই কঠিন নয়, চোখের কোনা দিয়ে সামনে এবং পাশে দেখতে দেখতে খুব সহজেই হেঁটে যাওয়া যায়।

নীতু বইটা পড়তে পড়তে হেঁটে যেতে থাকে, বইটা খুব মজার একটা বই। কোন মন্ত্র কেমন করে পড়ে কোন ভূত আনা সম্ভব এই বইটিতে তার সবকিছু লেখা আছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে কোনো কোনো মন্ত্রের পাশে কেউ একজন কলম দিয়ে লিখে রেখেছে, "কার্যকর", কোনো কোনোটার পাশে লেখা, "প্রাণঘাতী" কিংবা "সমূহ বিপদ" ইত্যাদি ইত্যাদি। বইটা দেখে মনে হচ্ছে কোনো একজন এই বইয়ের মন্ত্রগুলো ব্যবহার করে দেখেছে। কোনো কোনোটা কাজ করে কোনো কোনোটা বিপজ্জনক। কী আশ্চর্য!

বাসায় আসার আগে নীতু বইটা তার ব্যাগের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলল। সে বই পড়তে পড়তে রাস্তায় হেঁটে হেঁটে বাসায় এসেছে দেখতে পেলে আব্বু বাসাটা মাথায় তুলে ফেলবেন!

বাইরের দরজাটা খোলা, নীতু দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখল আব্বু অপরিচিত একজন মানুষের সঙ্গে সোফায় বসে আছেন। নীতুকে দেখে ডাকলেন, বললেন, "নীতু মা, স্কুল শেষ হলো? এসেছিস।"

নীতু বলল, "হ্যাঁ আব্বু।"

আব্বু বললেন, "আয়, এদিকে আয়, তোকে তোদের দবির চাচার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।"

নীতু একটু এগিয়ে গেল, দবির চাচা নামক মানুষটার চেহারা এবারে ভালো করে দেখতে পেল। আধবুড়ো একজন মানুষ চেহারার

মাঝে কেমন যেন একটা চালবাজ ভাব, ঠিক কোথা থেকে এই চালবাজ ভাবটা এসেছে নীতু ধরতে পারল না। আব্বু বললেন, "দবির ভাই, এই যে আমার মেয়ে নীতু।"

মানুষটার মুখে মনে হলো একটা বিরক্তির ছাপ পড়ল। মনে হলো খুবই অনিচ্ছার সঙ্গে মাথা ঘুরিয়ে নীতুর দিকে তাকাল, চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হলো সে যেন নীতুর দিকে তাকাচ্ছে না একটা বড় তেলাপোকা কিংবা টিকটিকির দিকে তাকাচ্ছে! মুখটা কুঁচকে বলল, "অ। মেয়েটা তো দেখি বড় হয়েছে। আগে এই টুকুন ছোট ছিল।"

মানুষটা হাত দিয়ে যেটুকু ছোট দেখাল একজন মানুষের বাচ্চার পক্ষে এত ছোট হওয়া সম্ভব না। আব্বু বললেন, "হ্যাঁ। বাচ্চারা দেখতে দেখতে বড় হয়ে যায়।"

মানুষটা বলল, "একটু বড় হলে ভালো। চড়-থাপ্পড় দিয়ে কন্ট্রোলে রাখা যায়!"

আব্বু বললেন, "কী বলছেন দবির ভাই! কন্ট্রোল করতে চড়-থাপ্পড় দিতে হবে কেন?"

দবির চাচা নামের মানুষটা আব্বুর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বিরক্তির ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, ছোট বাচ্চা মানেই যন্ত্রণা। ছোট বাচ্চা মানেই ইবলিস। সাক্ষাৎ ইবলিশ!"

দবির চাচার কথা শুনে নীতু এত অবাক হলো যে, সেটি বলার মতো নয়! উত্তরে সে কিছু একটা বলতে চাইছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর কিছু বলল না, হাঁ করে এই বিচিত্র চালবাজ ধরনের মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইল।

দবির চাচা আবার নীতুর দিকে তাকাল, মুখের এক কোনা ওপরে তুলে বলল, "স্কুল থেকে আসছ? কোন ক্লাসে পড়।"

নীতু বলল, "ক্লাস এইট।"

দবির চাচা আবার আব্বুর দিকে তাকাল, বলল, "আমার কী মনে হয় জানো? মেয়েলোকের লেখাপড়াটা আসলে দেশের ক্ষতি। ন্যাশনাল লস। তুমি পয়সাপাতি-টাকা খরচ করে মেয়েকে পড়াবে

আর সে কী করবে? শ্বশুরবাড়ি গিয়ে হাজব্যান্ডের জন্যে রান্না করবে। শ্বশুর-শাশুড়ির জন্যে রান্না করবে। আরে বাবা ভাত রান্না করার জন্যে কী আর পড়ালেখা করতে হয়?"

মানুষটার কথা শুনে নীতুর প্রায় হার্টফেল করার অবস্থা হলো। বলে কী মানুষটা? তার ইচ্ছে করল স্কুলের ব্যাগটা দিয়ে মানুষটার মাথায় দড়াম করে মেরে বসে, অনেক চেষ্টা করে নিজেকে শান্ত রাখল।

দবির চাচার কথা শুনে আব্বুও খুব অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন, বললেন, "আরে না, না! আপনি এসব কী বলছেন? এখন কী আর সেই আগের যুগ আছে নাকি যে মেয়েরা ঘরে বসে রান্না করবে। মেয়েরা এখন সব কিছু করে। তাছাড়া আমাদের নীতু লেখাপড়ায় খুব ভালো। বড় হয়ে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-সায়েন্টিস্ট কিছু একটা হয়ে যাবে!"

আব্বুর এত বড় লেকচারেও কোনো কাজ হলো না। মানুষটা আরো জোর গলায় হাত নেড়ে বলল, "আরে ধুর! মেয়েলোকের আসল জায়গা হচ্ছে তার স্বামীর ঘর। স্বামীর সেবা করবে। বাচ্চা মানুষ করবে। শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করবে। বুড়ো হলে পা টিপে দেবে, তেল মালিশ করে দেবে–"

নীতু অনেকক্ষণ সহ্য করেছে, আর পারল না। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল, "আমার আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নাই? আমি বসে শ্বশুর-শাশুড়ির পায়ে তেল মালিশ করে দেব?"

দবির চাচা নীতুর এই খিঁচুনির জন্যে প্রস্তুত ছিল না, চমকে উঠে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, "অ্যাঁ?"

নীতু বলল, "আমার শ্বশুর-শাশুড়ি যদি বলে তাদের পায়ে তেল মালিশ করে দিতে তাহলে তাদের খবর আছে! সেই পা নিয়ে আর হাঁটতে হবে না!"

দবির চাচা আঁতকে উঠলেন, বললেন, "কী? কী বললে?"

"ইভা তখন ঘুষি মেরে সেই মানুষটার সামনের দুইটা দাঁত ফেলে দিয়েছিল। এখন দাঁতের ফাক দিয়ে পিচিক করে থুতু ফেলতে খুব সুবিধা কিন্তু অন্য সব কাজে অসুবিধা!"

আব্বু ধমক দিয়ে বললেন, "কী শুরু করেছিস নীতু? ভেতরে যা, হাত-মুখ ধুয়ে মানুষ হ।"

নীতু তখন গটগট করে হেঁটে বাসায় ভিতরে ঢুকে গেল।

দবির চাচা আব্বুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী বলে তোমার মেয়ে? আদব-লেহাজ নাই? বড়-ছোট মান্য নাই। একজন মেয়ে থাকবে মুখ বন্ধ করে। তাকে দেখা যাবে কিন্তু শোনা যাবে না—"

আব্বু বললেন, "আপনি তো দেশের বাইরে ছিলেন, খবর রাখেন না। মেয়েরা আর আগের মেয়ে না, কোনো কথা পছন্দ না হলে উল্টো কথা বলে ফেলে।"

দবির চাচা বললেন, "না, না, না। তুমি তোমার মেয়েকে ঠিক করে মানুষ কর নাই! বলে কী তোমার মেয়ে? ঘুষি মেরে মানুষের দাঁত ফেলে দেয়? কী সর্বনাশ!"

আব্বু কী বলবেন বুঝতে না পেরে হাসি হাসি মুখ করে দবির চাচার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে থাকেন।

নীতু রেগে-মেগে রান্নাঘরে গিয়ে আম্মুকে খুঁজে বের করল, থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করল, "আম্মু এই খারাপ মানুষটা কে?"

নীতু কার কথা বলছে বুঝতে আম্মুর কোনো সমস্যা হলো না, একটু হাসার চেষ্টা করে বললেন, "ও! দবির ভাই? তোর একজন দূর সম্পর্কের চাচা। কেন? কী হয়েছে?"

নীতু বলল, "দূর সম্পর্কের চাচা দূরে থাকলেই পারে! কাছে আসতে কে বলেছে? আমাদের বাসায় এসেছে কেন?"

আম্মু বললেন, "মিডল ইস্টে থাকে। দেশে বেড়াতে এসেছে।"

নীতু আঁতকে উঠে বলল, "সর্বনাশ! কত দিন থাকবে?"

আম্মু বলল, "সেটা কী করে বলি? একজন এলে তাকে কি জিজ্ঞেস করা যায় কতদিন থাকবে?"

"তোমাদের লজ্জা লাগলে বল, আমি গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসি কতদিন থাকবে!"

"ধুর বোকা মেয়ে। ফাজলেমি করবি না।"

নীতু মুখ শক্ত করে বলল, "আম্মু, আমি মোটেও ফাজলেমি করছি না। এই খারাপ মানুষটা কী বলে জানো? বলে ছোট বাচ্চারা নাকি ইবলিস। আর কী বলে জানো? বলে মেয়েদের লেখাপড়া করানো নাকি ন্যাশনাল লস! আর কী বলে জানো?"

আব্বু বললেন, "জানি। তোকে আর বলতে হবে না। যা হাত-মুখ ধুয়ে আয়, কিছু একটা খা।"

নীতু বলল, "না আম্মু। তোমাকে শুনতে হবে এই মানুষটা আর কী কী বলেছে।"

"আমার আর শুনতে হবে না। আমি জানি। মানুষটা একটু পাগল ধরনের, একটু পুরানা মডেলের। একটু"

"না আম্মু। মানুষটা খালি পাগল আর পুরানা মডেলের না, মানুষটা হচ্ছে খারাপ একটা মানুষ। খারাপ আর পচা। পচা পচা পচা!"

নীতু এমনভাবে মুখ বিকৃত করল যে, দেখে আম্মু হেসে ফেললেন।

For More Books Visit www.BDeBooks.Com